Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 10 – 18
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তা হিসাবে গোবিন্দদাস

অভিষেক কর্মকার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
বালুরঘাট কলেজ, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর
Email ID : avishekkarmakar286@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Modern consciousness, love, liberation, elegant taste, generosity, Gaudiya philosophy, Poetry, Romanticism, Comprehensive approach.

Abstract

Govinda das was a linguistic genius of the Middle Ages. Verses written about Radha Krishna Leela are rare in Bengali literature. Although he is a Medieval Vaishnava poet, he is modern in his thinking. His achievements as a poet are quite commendable. Govinda das developed his genius level by level, for which he deserves considerable praise in the Padavali literature of the Middle Ages. We can see the theory and deep knowledge of Vaishnava philosophy in his verses. At first glance it may seem that only Radha Krishna's theory is expressed in its terms, but if we carefully observe the paths, we can see the shadow of life reflected in it. Chaitanyadev came to give a different dimension to Padavali literature, we can divide Padavali literature into two parts. As predecessors of Chaitanya we identify Vidyapati and Chandidas, whose poetic talent is quite admirable. But when Chaitanya came, a new trend was created in Bengali literature. But the name of Govinda Das will be remembered as Chaitanya's successor. Govinda Das was a devotee on the one hand and a poet on the other hand, and his poems, combining these two genres, deserve considerable prestige. Vaishnava terms were composed in Medieval times but his literary ideas are quite relevant in modern times. A combination of contemporary consciousness and modern consciousness developed in capturing the message of Vaishnava poets. Govinda Das was born after Chaitanya Dev's death so he expressed his regret in many terms that he did not see Chaitanya Dev with his own eyes. Govinda das composed the verses in harmony with the Gaudiya Vaishnava philosophy, so his poetic talent blossomed in his own characteristics, his poems are like a mine of nectar. If judged from an external point of view, apparent complexity and use of complicated words can be seen in his verses, therefore his verses must be judged with a deep mind. Compared to other Padaktaras after Chaitanya, he is quite modern and the most famous poet in his era. He was a poet of beauty. Among the verses expressed in a deep sense, not only in Radha Krishna Leela, but also in modern human consciousness. That is why he is modern and relevant today. Even though his mind was formed in a Medieval way, here is the significance of Govinda Das.

Discussion

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরটি চৈতন্য পূর্ববর্তী, দ্বিতীয় স্তরটি চৈতন্য সমকালীন ও তৃতীয় স্তরটি চৈতন্য পরবর্তী। চৈতন্য পূর্ববর্তী স্তরে আমরা জয়দেব ছাড়া আরো দুজন কবিকে পাই তারা হলেন বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস। বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার লোক তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর পদাবলীগুলো বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য পূর্ববর্তী কালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। বিদ্যাপতির পদ গুলোতে চৈতন্যদেবের বেশ আগ্রহ ছিল। বিদ্যাপতি মোটামুটি ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু চন্ডীদাস এর জীবনকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমরা জানিনা। চৈতন্যদেব চন্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা শুনতেন সুতরাং মনে করতে পারি তিনি চৈতন্যের পূর্ববর্তী, কিন্তু কতদিন আগেকার লোক ছিলেন তা বলা যায় না। চন্ডীদাসের সমস্যা এখানেই শেষ নয় কারণ তার নামে অজস্র পদ পাওয়া গেছে। যদিও সেগুলোর অধিকাংশই চৈতন্য পূর্ববর্তী সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই কিন্তু বাকি কিছু পদ চৈতন্য পরবর্তীকালেও রচিত। তবে এই কথা অস্বীকার করা যাবে না চৈতন্য সমকালীন ও চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তাদের অনেক ভালো পদ চন্ডীদাসের নামে প্রচারিত আছে। চৈতন্য সমকালীন যেসব পদকর্তা পাওয়া যায় তাঁরা হলেন - গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, নরহরি দাস, বংশীবদন, মাধব, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, অনন্ত দাস।

চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী তিনটি স্তরে ভাগ করতে হয়। প্রথম স্তর-ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। দ্বিতীয় স্তর-সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। তৃতীয় স্তর-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত। প্রথম স্তরের মুখ্য পদকর্তারা হলেন চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্তের শিষ্যরা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন নিত্যানন্দ পত্নী অথবা নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের শিষ্য। আবার কেউ কেউ ছিলেন শ্রীখন্ডের নরহরি দাসের বা রঘুনন্দনের শিষ্য। প্রথম স্তরের পদকর্তাদের মধ্যে পড়েন-নরোত্তম, গোবিন্দদাস, যদুনাথ, যদনন্দন, বল্লভ, কানাই, শেখর, শ্যামদাস, ঘনশ্যাম প্রমূখ। দ্বিতীয় স্তরের পদকর্তারা হলেন-বিপ্রদাস ঘোষ, নসির মামুদ, ঘনরাম দাস, জগদানন্দ, বৃন্দাবন, রাধামোহন, প্রেমদাস প্রমূখ। তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত হলেন-চন্দ্রশেখর ও শশী।

গোবিন্দদাস মধ্যযুগীয় সাহিত্যের এক ভাস্কর প্রতিভা। তিনি ছিলেন চৈতন্য পরবর্তী যুগের পদকর্তা। রাধা কৃষ্ণ লীলা নিয়ে রচিত পদগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী পদ কর্তাদের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অলংকার ব্যবহারে ছন্দ ঝংকার কাব্যিক ছন্দ প্রয়োগ ও বিভিন্ন কলা কুশলতায় তিনি অনবদ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভাবাদর্শ ও জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় তাঁর কাব্যগুলিকে এক অসাধারণ সৌন্দর্য দান করেছে। আর কবি প্রতিভা বহু বৈষ্ণব মহাজনের স্বীকৃতিতে ও প্রশংসায় ধন্য। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মেছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্ত, চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। শ্রীনিবাসের কাছে পদ রচনার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ পাঠ করার পরামর্শ দেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদগ্ধ পন্ডিত গোবিন্দদাস বৈষ্ণব দর্শন ও রস শাস্ত্র পর্যাপ্ত পাঠ করে পদাবলী রচনায় হাত দেন।

শুধু রাধা কৃষ্ণ লীলা নয়, গৌরাঙ্গ বিশ্বাস পদ রচনা, গোবিন্দদাস অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অপূর্ব কাব্য সৌন্দর্যময় ভাষা বাংলা পদাবলী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনার শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। যদিও তাঁর জন্ম শ্রী চৈতন্যের মৃত্যুর কয়েক বছর পর, মহাপ্রভুকে তিনি কখনো স্বচক্ষে দেখেননি তবুও তাঁর রচনায় কবি হৃদয়ের কল্পনা ও ভক্তের আকুতি এই দুইয়ের সমন্বয়ে অসামান্য কাব্য রচনা করেছেন।

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।"[১]

পদটি শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ের তদুচিত গৌর চন্দ্রিকা। এখানে চৈতন্যদেবের এক ঐতিহাসিক মূর্তি অঙ্কন করেছেন গোবিন্দদাস। নীরদ অর্থাৎ মেঘরূপ নয়ন থেকে অবিরল জল গৌরাঙ্গ রূপি পুষ্প বৃক্ষে পড়ছে। সেখান থেকে নির্গত

হচ্ছে পুলক রূপ মুকুল। অর্থাৎ রাধা ভাবে ব্যাকুল চৈতন্যদেবের নয়নে মেঘ রূপে কৃষ্ণ লেগেই আছেন। চৈতন্যদেবের রাধাভাবদ্যুতি মূর্তিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন গোবিন্দদাস। এই নটবর কিশোর শ্রী গৌরাঙ্গ কে কবি অভিনব হেম কল্পতরু বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা কল্পতরুর কাছে যা চাই তাই পাই তেমনি কল্পতরু-রূপ চৈতন্যদেব আমাদের সবকিছুই দান করেন। পদটির মধ্যে গোবিন্দ দাস মহাভাবময় শ্রী চৈতন্যের ঐতিহাসিক মূর্তি অঙ্কন করেছেন যা তাঁর কবি কৃতিত্বের পরিচায়ক। পদটি সম্পর্কে শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন -

> "মধ্যযুগের একজন কবি বিভোর হইয়া একখানে ছবি দেখিতেছেন-দেখিতেছেন ও রূপ দিতেছেন; স্পষ্ট বোঝা যায় কবি একজন পরম ভক্ত-ভাবাকুল হৃদয়; কিন্তু সেই সঙ্গে অদ্ভুত সংযমও তাঁহার আয়ত্তে। হৃদয়ের আকুলতাকে কোথাও তিনি অকূল করেন না।রূপদক্ষ শিল্পীর মতো যথাদৃষ্ট রূপকে ভাষার তুলিকায়,অপূর্ব লাবণ্য রসে ডুবাইয়া টানের পর টানে ফুটাইয়া চলেন। একটা পরিপূর্ণ প্রাণ সংযুক্ত চিত্র স্ফুটপদ্মের মতো ভাসিয়া ওঠে।"[২]

গোবিন্দদাস বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র মধ্যযুগেই নয় তাঁর কবিকৃতি আধুনিককালেও দুর্লভ। তাঁর কাব্যের মধ্যে যে বিষয়টি তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে তা হল রূপশিল্প নির্মাণ। তাঁর মত সচেতন শিল্পী আধুনিক কালেও বিরল। এ বিষয়ে চৈতন্য পূর্বযুগের বিদ্যাপতি ও চৈতন্য পরবর্তী যুগের ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। তিনি তাঁর কবি ভাবনা দিয়ে রসবোধ ও তীক্ষ্ণ শিল্পদৃষ্টির সামঞ্জস্যে একটির পর একটি পদ রচনা করে গেছেন। ফলে কখনো কখনো তাঁর কাব্যে ভাবাবেগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ পাঠক অনুভব করে তাঁর কাব্যের ভাবাবেগ চন্ডীদাস বা বিদ্যাপতির পদ অপেক্ষা অল্প, কিন্তু সর্বাঙ্গিন বিশ্লেষণে এ বিষয়ে কোন বিরোধ থাকে না। তাই আমরা বলতে পারি গোবিন্দদাসের কাব্যে রূপ ও রসের সার্থক মেলবন্ধন ঘটেছে। এই ভাবেই তিনি তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলিতে শ্রী গৌরাঙ্গের দিব্যরূপ ভাব তন্ময়তা ও প্রেম ধর্মের বৈশিষ্ট্য কে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই পদটিতে আমরা শ্রী চৈতন্যের পূর্ণ রূপ রূপ লাভ করি।

গোবিন্দদাস ছিলেন ভক্ত কবি। ভক্তের শ্রদ্ধা ও শিল্পীর তন্ময়তা নিয়ে তিনি রাধা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের মধ্যে একটাই পার্থক্য-জ্ঞানদাস পদ রচনা করার সময় বারবার আবেগের বশীভূত হয়ে পড়তেন। কিন্তু গোবিন্দ দাস আবেগের আতিশয্যে প্রভাবিত হয়ে পড়েননি। আবেগকে নির্দিষ্ট সংযমের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কাব্যগুলিতে। রাধা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার পদগুলিতে আবেগের সংযমকে আমরা লক্ষ্য করি। চৈতন্য পূর্ব যুগে কৃষ্ণের চোখ দিয়েই রাধার রূপ বর্ণনা করা হতো। কারণ কৃষ্ণ সেখানে রাধার রূপ মুগ্ধ প্রণয়ী। কিন্তু বিবর্তন দেখা দিল চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের পর। চৈতন্য দেবের মধ্যে দেখা দিয়েছিল রাধার ভাব তন্ময়তা, তাই চৈতন্য পরবর্তী রূপ বর্ণনার পদগুলিতে বারবার কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। এই পার্থক্য চৈতন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদকর্তাদের একে অপরের থেকে আলাদা করেছে। গোবিন্দদাস ও এর ব্যতিক্রম নন, তাঁর একটি পদ ব্যাখ্যা করলেই আমরা এর সম্যক পরিচয় পাব।

"নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দিত সিন্ধুর ভঙ্গ।।"[৩]

চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তাদের পদ গুলোর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। এই পদটি ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার পদ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ চন্দ্র ও চন্দনের গন্ধের চেয়েও অনেক বেশি। তা চন্দ্রকেও হার মানায়। তিনি মেঘের মতো সুন্দর। প্রেমে আকুল সমস্ত গোপ নারীদের তিনি আরাধ্য। এভাবে অনুপ্রাসের ছন্দে কবি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার পদের সঙ্গে গোবিন্দ দাসের পদের পার্থক্য হল, জ্ঞানদাসের রূপ বর্ণনায় অন্তর্লীন ভক্তির সঙ্গে মিশে আছে শিল্পীর আবেগ সেখানে রূপ দর্শন আবেগের বশীভূত হয়ে

যেন সমুদ্রের হিল্লোল তুলেছে। অপরদিকে গোবিন্দদাস সম্পূর্ণভাবেই ভক্তের দৃষ্টি নিয়ে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে কুঞ্জ মন্দিরের প্রাধান্য তিনি স্বীকার করেছেন। কুঞ্জ মন্দিরের মধ্যে মিলনের যে মাহাত্ম্য তা তাঁর এই পদটিতে ব্যক্ত। তাঁর কৃষ্ণ রূপ দর্শনের মধ্যে রয়েছে ভক্তের আকুতি। সেজন্যই ভনিতাই কৃষ্ণের চরণ তলে আশ্রয় নেওয়ার আকুতি জানিয়েছেন তিনি।

পূর্বরাগ-অনুরাগপর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা উভয়েরই পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন। বিদ্যাপতির পূর্বরাগ পর্যায়ে ও গোবিন্দদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে গোবিন্দদাসের ভক্তির ভাব, কিন্তু শ্রীরাধার রূপ অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এখানে শৃঙ্গার রসকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাঁর রচিত একটি পদ উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে-

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মূরছা পায়।।"[8]

পদটি অনুরাগের পদ। কৃষ্ণের রূপ দর্শনে রাধা আকুল হয়েছেন। কৃষ্ণের তরুণ অঙ্গের লাবণ্য যেন সারা পৃথিবীতে প্লাবিত করছে। তাঁর অধরের ঈষৎ হাসির হিল্লোলে মদন যেন মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণকে দেখার পর রাধার আর ধৈর্য থাকছে না, সর্বদাই তাঁর চিত্ত বেঙ্গলি তো হচ্ছে। কৃষ্ণ বারবার হেসে হেসে অঙ্গ দুলিয়ে নাচে এবং চোখের কটাক্ষ করে রাধার পরাণ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। কৃষ্ণের গলার মালতি ফুলের মালাটি তাঁর বুকের মাঝখানে দোলে। মত্ত ভ্রমর উড়ে উড়ে কৃষ্ণের আশেপাশে ঘোরে। লোকের সম্মুখে রাধা মুখ দেখাতে পারেনা, তাঁর মনের কথা মনেই রয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত রাধার কি হবে তা ভেবে স্বয়ং গোবিন্দদাস আশঙ্কা করেন। গোবিন্দদাসের প্রতিভার সার্বিক সিদ্ধি এই পদটির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই। প্রেমিক ও প্রেমিকার হৃদয়ের দোলাচল অবস্থার কথা পদটির মধ্যে ব্যক্ত। নারীর হৃদয় বারবার খুঁজে চলেছে তার মনের মানুষকে। এখানে কৃষ্ণ ও আধুনিক নর-নারীর মধ্যে কোন বিভেদ নেই। প্রেম সব পর্যায়েই একই রকম আর এর অনুভূতিগুলো যেকোনো যুগেই যে কোন মানুষের মনেই ছাড়া জাগাতে পারে, একথায় রূপানুরাগের এই পদটিতে সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গোবিন্দ দাস। আবার আরেকটু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই-গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যে কীর্তন ও নৃত্যের মাধ্যমে ভক্ত ও ভগবানের মেলবন্ধন-এই বিষয়টিকেও রূপ দিয়েছেন তাঁর পদের মধ্যে। ভক্ত মন না হলে শুধুমাত্র কবি মন দিয়ে মধ্যযুগে এরকম পদ রচনা সম্ভব না। গোবিন্দদাস একাধারে ভক্ত ও কবি, এই দুইয়ের সমন্বয়ে রচনা করেছেন এই পদটি। যা রচিত মধ্যযুগে কিন্তু বিষয় ভাবনায় আধুনিক। তাঁর পূর্ব রাগের ও অনুরাগ পর্যায়ের আরো বেশ কিছু উৎকৃষ্ট পদ রয়েছে, সেইসব পদ আলোচনা করলে প্রবন্ধটি বেশ দীর্ঘ হয়ে যাবে, সেই জন্য আমরা তাঁর আরো বিভিন্ন পর্যায় ও পদগুলির বিশ্লেষণ করে মূলভাবটি বজায় রাখতে সচেষ্ট হব। আমরা একই সঙ্গে প্রবন্ধের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবো তাঁর আধুনিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা। শুধুমাত্র মধ্যযুগেই নয় তিনি আধুনিক যুগেও কতটা প্রাসঙ্গিক সে বিষয়টি তুলে ধরবো।

অভিসার পর্যায়ের পদ রচনায় গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ কবি। এই পর্যায়ের বিশ্লেষণ করার আগে আমরা গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। এ বিষয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু কিছু মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যা তাঁর বিষয়ে বেশ প্রাসঙ্গিক -

> "গোবিন্দদাস খাঁটি লিরিক কবি নহেন, কাব্যের মধ্যে তাঁহার অবতরণ ঘটে নাই। তিনি অন্যের বেদনাকে- তাহার লীলা ও রসকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহা শেষ পর্যন্ত অপরের রহিয়া গিয়াছে। চন্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে রাধার সহিত একাত্ম হইবার প্রচেষ্টা বহু স্থলে; তাই অন্যের বেদনা বা আনন্দ বাহ্যত তাঁহাদের কাব্যের উপজীব্য হইলেও যথার্থত, কবির প্রাণাবেগ তাহাতে মুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বহু ক্ষেত্রে তাহা

> মন্ময় গীতি কবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে। গোবিন্দদাসের কাব্যে ইহা ঘটে নাই। ঘটিয়াছে, কি, না দুটি বস্তু- নাটকীয়তা ও চিত্রধর্মিতা।"[৫]

গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভা সম্পর্কে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর এই বক্তব্যটি বেশ প্রাসঙ্গিক। এই বক্তব্যটি থেকে তাঁর কবি ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। এই কবি ধর্মের আলোকে আমরা তাঁর অভিসার পর্যায়ের কয়েকটি পদ আলোচনা করব। এই পর্যায়ে প্রবেশ করার আগে কিছু পূর্বসূত্র আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। চৈতন্য পূর্বযুগের কবি বিদ্যাপতির অভিসার বিষয়ক পদে বেশ গভীরতা আছে কিন্তু গোবিন্দ দাসের মতো বৈচিত্র নেই। এছাড়াও অভিসারের মধ্যে নায়ক নায়িকার হৃদয়ের আকুলতা,গভীর আবেগ,নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, দুরূহ দুর্গম কে উত্তীর্ণ হওয়ার যে ব্যাকুলতা ও ইচ্ছা থাকে তা শুধুমাত্র গোবিন্দদাসের পদগুলোর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাপতির পদে সেগুলো অনুপস্থিত। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'কে যথাযথ অনুসরণ করেছেন গোবিন্দদাস। গ্রন্থ মধ্যে অভিসারের যে কয়েকটি লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অনুরূপভাবে ভক্ত কবি তাঁর পদ গুলোর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যেও অভিসারের কথা আছে। চৈতন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক পদকর্তায় অভিসার পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন। কিন্তু এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস।

> "কন্টক গাড়ী কমল-সম পদতল
> মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
> গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল
> চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।"[৬]

পদটি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো কেন গোবিন্দদাস কে অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। এটি শ্রীরাধার অভিসার পর্যায়ের পদ। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে অভিসারের কথা এখানে বর্ণিত হয়নি, অভিসার যাত্রার পূর্বে রাধার প্রস্তুতি পর্বের কথা এখানে বর্ণনা করেছেন কবি। প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রেমিকার যে ব্যাকুলতা যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা-এই চিত্রটি ফুটে উঠেছে পদটির মধ্যে। রাধা-কৃষ্ণ লীলার অবয়বে বর্ণিত পদটির মধ্যে আধুনিক মানুষের প্রেমিক চেতনায় ব্যক্ত। রাধা কৃষ্ণের কাছে অভিসারে যাওয়ার জন্য পায়ের নূপুরে কাপড় বেঁধেছেন, কলসির জল ঢেলে প্রাঙ্গন পিচ্ছিল করে, আঙ্গুল টিপে টিপে দুর্গম পথে চলার অভ্যাস করেছেন। তাঁর অভিসারের পথ অন্ধকার তাই হাত দিয়ে নিজের চোখ বন্ধ করে সেই অন্ধকার পথে চলার অভ্যাস করেন রাধা। পথে সাপের ভয় এবং সেই সাপের ভয় থেকে বাঁচবার জন্য সাপের মুখ বাধার কৌশল শিক্ষা করেন। গুরুজনদের কথা তিনি যেন কানেই শুনতে চান না। পরিজনদের কথা শুনে বোকার মতো হাসেন। রাধার পথ চলার মধ্যে আধুনিক কোন নারীর তার প্রেমিকের উদ্দেশ্যে যাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাব।গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ গুলোর মধ্যে আমরা যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করি তা হলো সবকিছুর মধ্যেই একটি সামঞ্জস্য বজায় রাখার ভাব। আবেগের আতিশয্যে তিনি কখনোই হারিয়ে যাননি, সেই আবেগকে সংযত করে তাঁর পদ গুলোর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। অভিসারের আরেকটি পদের মধ্যে তাঁর কবি প্রতিভা ও আবেগের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি।

> "মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
> চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
> তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
> বারি কি বারই নীল নিচোল।।
> সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
> হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার।।"[৭]

গোবিন্দদাস ছিলেন একাধারে ভক্ত ও কবি। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ভালো ভাবেই অধ্যায়ন করেছিলেন। সেই জন্য অভিসারের যে কয়েকটি পর্যায় উক্ত গ্রন্থে রয়েছে তার বেশিরভাগই গোবিন্দদাসের পদগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। এই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 10-18
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পদটি বর্ষাভিসারের। বর্ষার দুর্দিনে শ্রীরাধা কৃষ্ণর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় অভিসারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন দেখে, সখী তাকে নিবৃত করার জন্য বলেছেন-ঘরের বাইরে রয়েছে দৃঢ় কপাট। বাইরে যাওয়ার পথ একেবারেই বন্ধ। বর্ষাকালে বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে সেইজন্য পথও অত্যন্ত দুর্গম। এই বৃষ্টিতে রাধার নীল শাড়ি ভিজে যাবে। এর মধ্যে রাধা কী করে অভিসার করবেন। কৃষ্ণ রয়েছে বহুদূরে মানস গঙ্গা পারে তাঁর সঙ্গে মিলনের পথ অত্যন্ত দুর্গম। এসব জেনেও রাধা যদি অভিসারে বেরিয়ে যায় তবে বলতে হয় প্রেমের জন্য তিনি দেহকে উপেক্ষা করবেন। ভণিতায় গোবিন্দদাস সখীকে নয় শ্রীরাধাকেই সমর্থন করেছেন। শেষে তিনি এমন একটি কথা বললেন যা ঐতিহাসিক, ধনুক থেকে বের হওয়া তীরকে যেমন ফেরানো যায় না তেমনি প্রেমিকের সঙ্গে মিলনে ব্যাকুল রাধাকে নিবৃত করা অসম্ভব। শঙ্করীপ্রসাদ বসু আলোচ্য পদটি সম্পর্কে বলেছেন-

> "যাহার কান আছে সে এই সঙ্গীত শুনিবে, যাহার প্রাণ আছে সে সঙ্গীতাশ্রিত ভাবহিল্লোলে আপ্লুত হইবে। বৈষ্ণবকাব্যে-ধ্বনিমন্ত্র যেখানে সিদ্ধবস্তু-সেখানেও এমনটি সুলভ নয়।"[৮]

অভিসার পর্যায়ের পরই গোবিন্দদাস যে পর্যায়ে সর্বাধিক সিদ্ধি অর্জন করেছেন তা হল রাসের পদ। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করতে পারি। রাস লীলার মধ্যে রয়েছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তার কাব্যরূপ দিয়েছেন তিনি। রাসলীলা অভিসারের একটি সম্পর্ক আছে গতির দিক থেকে। কিন্তু অভিসারের পদ গুলোই বেশি জনপ্রিয় তার কারণ হলো, অভিসার পর্যায়ের পদ গুলোর মধ্যে রয়েছে রাধার আত্মসচেতনতা। কিন্তু গোপীদের মধ্যে তা সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়নি রাসের পদগুলিতে। রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা অতি গভীর। হরিবংশ-এ এ একে বলা হয়েছে'হল্লিসক ক্রীড়া'। এই গ্রন্থে শারদ রাসের কথা বলা হয়েছে যা শুক্লপক্ষের রাস। এখানে গোপী ও গোপ-বালকরা কৃষ্ণকে ঘিরে নৃত্য করে। ব্রজের যুবতীরা আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, কৃষ্ণের প্রেমময় সঙ্গীতে আকৃষ্ট গোপীদের নিয়ে তিনি রাসমণ্ডল রচনা করে অনুলোম ও প্রতি লোমগতিতে তাদের সঙ্গে নৃত্য করছেন। আর যারা গৃহ থেকে বের হতে পারছেন না তারাও মনে মনে কৃষ্ণ নাম করে মুক্তি পাচ্ছেন। সেই জন্য ধর্মীয় মাহাত্ম্য কখনোই অস্বীকার করা যায় না রাস উৎসবের।

"শরদ চন্দ্র পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।"[৯]

গোবিন্দদাসের এই পদটি রাস লীলা পর্যায়ের পদ। তাঁর সৌন্দর্য চেতনা এই পদটির মধ্যে ব্যক্ত। তিনি আমাদের সামনে একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শরৎকালের আকাশে চাঁদ উঠেছে, বাতাস বইছে মৃদু গতিতে উদ্যান ভরে আছে ফুলের গন্ধে, প্রস্ফুটিত মল্লিকা ফুলের গন্ধে তারা আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে মৌমাছিরা। প্রকৃতির এক অপূর্ব সুন্দর চিত্র এঁকেছেন তিনি। এ যেন একটি মায়া লোক। এই পরিবেশে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। তাঁর বাঁশির শব্দে সমস্ত গোপীরা আকুল। কৃষ্ণের সাথে মিলনের জন্য তাঁরা ঘর ছেড়েছেন। এ যেন এক ধ্যানমত্ততা। ফুল দেখে মৌমাছিরা যেমন আকর্ষিত হয় তেমনি কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে তাঁর সঙ্গে মিলনের আকর্ষণে ব্রজের সমস্ত গোপীরা আকর্ষিত হয়েছে। সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তাঁরা একে একে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। পদটির মধ্যে গোপীদের দুইটি সত্তা পাওয়া যায়। প্রথমে তাদের গতি ছিল মন্থর তারপর আবেগের বশীভূত হয়ে ও কামনার তীব্রতায় তাঁরা দ্রুতগতিতে কৃষ্ণের দিকে ভাপমান হয়েছেন। কিন্তু পদটি গোবিন্দ দাসের মৌলিক রচনা নয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধের একটি শ্লোক অবলম্বনে তিনি পদটি রচনা করেন। তাঁর পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অনুযায়ী কৃষ্ণ গোপীদের প্রেম কামনা করেই বাঁশি বাজান। গোপীরা যেমন কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল তেমনি কৃষ্ণও গোপী প্রেমে ব্যাকুল। অনিবার্য আকর্ষণ ও গতির আবেগ এই দুটি বৈশিষ্ট্যকেই গোবিন্দদাস ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব এতটাই প্রাসঙ্গিক যে, সাহিত্যের যেকোনো ক্ষেত্রে সেটি এসেই পড়ে। চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি ও চৈতন্য পরবর্তী কবি গোবিন্দদাসের কথা আমাদের এই আলোচনার ক্ষেত্রে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে চৈতন্যদেব এসে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কে দুটি পর্বে ভাগ করে দিয়েছেন। মাথুর পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাস তাঁর পূর্ববর্তী বিদ্যাপতির মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণির প্রকরণ অনুযায়ী বিরহের তিনটি পর্যায় নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। এই তিন ধরনের পর্যায়ে গুলি হল ভাবী (কৃষ্ণ চলে যাবেন অবস্থা), ভবন (কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন) ও ভূত (কৃষ্ণ চলে গেছেন অবস্থা) বিরহ।

"নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজ-মাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ-অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ।।"[১০]

পদটি সুদূর প্রবাসের অন্তর্ভুক্ত ভবন বিরহের পদ। রাধা শফিকে বলছেন মথুরা থেকে কৃষ্ণকে ব্রজে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি এসেছেন তাঁর নাম অক্রূর হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর মত ক্রুর আর কেউ নেই। কৃষ্ণ চলে যাবেন বলে প্রতি ঘরে ঘরে অমঙ্গল জনক শব্দ ঘোষণা করে চলেছেন। রাধা কৃষ্ণ বিরহের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, তিনি সখীকে অনুরোধ করছেন-সখী যেন এমন কোন উপায় অবলম্বন করেন যাতে রাত্রি আর প্রভাত না হয়। তাহলে কৃষ্ণ আর যেতে পারবেন না তাকে বাড়িতেই থাকতে হবে। কোন যোগিনীর পায়ে ধরে অনুরোধ করা হোক সে যেন তার যোগবল দিয়ে চন্দ্রকে বেঁধে ফেলে। এর ফলে রাত্রি আর প্রভাত হবে না, রাধা আরো বলেছেন যমুনা দেবীর কাছে যেন প্রার্থনা করা হয় তিনি যেন তাঁর পিতা সূর্যকে উদিত হতে নিষেধ করেন। ভণিতায় গোবিন্দদাস বলছেন-সূর্য কি তাঁর পুত্র যমকেও এনে মেলাবেন। তাহলে রাধার যন্ত্রণার নিষ্কৃতি ঘটবে। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ শুধু রাধার কাছেই নয়, সমগ্র বৃন্দাবনবাসীর কাছে কতখানি মর্মান্তিক ঘটনা তা গোবিন্দদাস পদটির প্রথমাংশেই বলেছেন। দুঃখের এই অনুভূতি যেন আমাদেরকেও স্পর্শ করে। সেই সঙ্গে সুখের প্রতি রাধার যে আন্তরিক অনুরোধ তাঁর মধ্যে রাধার অসহায়তা ও কৃষ্ণের প্রতি ব্যাকুলতায় স্পষ্ট। বিদ্যাপতি রাধা প্রচুর অর্থ দিয়ে মেঘকে তাঁর অভিসারের রাত্রে বর্ষণ ঘটানোর জন্য অনুরোধ করেছে। আর এখানে রাধা প্রকৃতির আবর্তনকেই স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন। সমস্ত নিয়মকে লংঘন করে কৃষ্ণকে ধরে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বড় করুণ ও হৃদয়স্পর্শী। এবার আমরা গোবিন্দদাসের একটি ভূত বিরহের পদ আলোচনা করে মাথুর পর্যায়ে গোবিন্দদাসের কবিকৃতিকে ফুটিয়ে তুলবো। বিদ্যাপতির মত না হলেও গোবিন্দদাস যে নিজ কবি প্রতিভা দ্বারা মাথুর পর্যায়ের পদগুলো রচনা করেছেন; সেই পদগুলোর মধ্যে তাঁর মৌলিকত্ব ও কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। পদটি আলোচনা করলেই সে বিষয়টি স্পষ্ট হবে-

"যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।।
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মযু অঙ্গে জ্যোতি হোই তথি মাহ।।"[১১]

গোবিন্দদাসের মাথুর পর্যায়ের পদ এটি। দশম দশায় উপনীতা রাধার উক্তি। উজ্জ্বলনীলমণিতে বিরহ দশার বিভিন্ন ভাব রয়েছে, তাঁর মধ্যে কোনো একটি ভাব অনুসরণ করে এই পদটি তিনি রচনা করেছেন। কৃষ্ণ বিরহে, যদি রাধার মৃত্যু হয় তখনও যেন কৃষ্ণ সেবাতেই রাধার মন প্রাণ নিয়োজিত থাকে, কৃষ্ণ যে পথ দিয়ে তার রক্তিম চরণ ফেলে চলে যান সেখানেই যেন রাধার দেহ মাটি হয়। যে সরোবরে কৃষ্ণ প্রত্যহ স্নান করেন রাধা যেন সেখানেই জল হন। এইভাবে রাধার কৃষ্ণ প্রাপ্তি হলে তাঁর জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না। পদটির মধ্যে এভাবেই বারবার রাধার আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। রাধা দেহ ও মনে পুরোপুরি কৃষ্ণের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে চেয়েছেন। কৃষ্ণের মধ্যেই আছে রাধার মুক্তি। রাধার মুক্তি চেতনা ও বিরহের আবেগ-অনুভূতি সবই যেন এই পদটির মধ্যে গোবিন্দদাস ফুটিয়ে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 10-18
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তুলেছেন। যদিও উজ্জ্বলনীলমণির ভাব অনুসরণ করে পদটি রচিত তবুও গোবিন্দ দাসের মৌলিক প্রতিভা পদটির মধ্যে বিকশিত হয়েছে। রাধার প্রেমের প্রকাশ এখানে গভীর ও আবেগ ময়। এই পুরো বৈশিষ্ট্যটিকেই তিনি নিজ কবিত্ব শক্তির দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন।

বল্লভদাস গোবিন্দদাসকে বলেছেন দ্বিতীয় বিদ্যাপতি। এর মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই। গোবিন্দদাস ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যেবিদগ্ধ পন্ডিত; তিনি পদ রচনা করতে আরম্ভ করেন তাঁর প্রৌঢ় বয়সে। তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বিদ্যাপতির রাজসিক ঐশ্বর্য দেখে কিন্তু এখানে ভুলে গেলে চলবে না বিদ্যাপতি ছিলেন চৈতন্য পূর্ব যুগের পদকর্তা তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে তাঁর কোনো সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু গোবিন্দদাসের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবাদর্শের প্রভাব পড়ে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, তাঁর একমাত্র উপজীব্য নয়। নানা ধরনের ঐতিহাসিক কাব্য ও অন্যান্য বহু বিষয়ে তাঁর সফল রচনা নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্প্রদায়গত নিষ্ঠার পরিবর্তে মধ্যযুগের মানুষ হয়েও তার কাব্যে দেখা যায় এক অসাম্প্রদায়িক জীবনচর্যা। কিন্তু এখানে বলে রাখা আবশ্যক-ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রাধান্য না দিয়ে মুক্ত ধর্মের জয়গান করেছেন তিনি। তিনি ছিলেন একাধারে ভক্ত-কবি। এই দুইটি সত্ত্বায় তাঁর কাব্যের মধ্যে দেখা যায়।

সবশেষে গোবিন্দদাসের আরেকটি পর্যায়ের আলোচনা করে এই প্রবন্ধটি শেষ করব। সেই পর্যায়টি হল কলহান্তরিতা। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাস কে বলতে হয়। এখানে নায়িকার নীরবতাই মানের প্রকাশ। তাঁর রাধা গুরু মানিনী। মান সূচনাতে চণ্ডীদাসের রাধার মতো ভিতরে ভেঙে পড়েন না। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত রাধার আত্মগ্লানি, দীনতা, শূন্যতাবোধকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গোবিন্দদাস।

"আন্ধল প্রেম পহিল নহি জানলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জ্বলত পরাণ।।"[১২]

পদটি কলহান্তরিতা পর্যায়ের। রাধা সখীর কাছে দুঃখ করে বলছেন-কৃষ্ণ প্রেমে অন্ধ হয়ে তিনি প্রথমে জানতেই পারেননি যে কৃষ্ণ বহুবল্লভ। তাই আরো প্রেম লাভের আশায় কৃষ্ণের সঙ্গে কলহ করেছেন। মদন আগুনে রাধার প্রাণ দিনরাত্রি জ্বলে যাচ্ছে। তিনি অন্তরের জ্বালা ব্যক্ত করছেন তাঁর সখীর কাছে। কৃষ্ণের দোষ দেখে যদি কেউ ক্রুদ্ধ হয় তাহলে তাকে ভীষণ কষ্ট পেতে হবে। এ কথা রাধা জানেনা বলেই কৃষ্ণের মিনতিকে উপেক্ষা করে মানকে বড় করেছেন। সেই জন্য হাতে-নাতে রাধা তাঁর ফল পাচ্ছেন। কৃষ্ণ দর্শনে ব্যাকুল রাধা তাঁর দর্শন না পেয়ে সমস্ত মানকে মন থেকে মুছে ফেলেছেন। ভণিতায় গোবিন্দদাস বলছেন কৃষ্ণ প্রেমে একই রকম। উজ্জ্বলনীলমণির প্রদত্ত কলহান্তরিতা নায়িকার সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি পদটি রচনা করেছেন। কলহান্তরিত নায়িকার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটিতে দেখা যায় সেইসব বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখে গোবিন্দদাস তার এই পথটি লিখেছেন। এখানে রাধার মধ্যে বিরহ ব্যাকুলতা ও কৃষ্ণ দর্শনের আকাঙ্ক্ষার কথা ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণ বিরহে রাধার এই ব্যাকুলতা সমস্ত চেনা ছককে অতিক্রম করে বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের এক নতুন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছে। রাধাকৃষ্ণ লীলার মধ্যে সমস্ত মানব-মানবীর প্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন পদকর্তা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রাধা কৃষ্ণ লীলা কথার সবচেয়ে প্রতিভাবান শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এঁরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের প্রভাবে পদাবলী সাহিত্যে বিপুল জোয়ার এসেছে। বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ চৈতন্যদেবের হাতেই শুরু হয়েছে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মন্ত্রে সে সময় সমগ্র জাতি একত্রিত হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই ধারাবাহিকতা গোবিন্দদাসের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী পদকর্তাদের ভেতর প্রবাহিত হয়েছিল। এই শতাব্দীকে তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে সুবর্ণ যুগ বলা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ভিত্তিক পদ রচনা করে তার মধ্যে শুধুমাত্র রাধা কৃষ্ণের কথায় নয়; সমগ্র মানব মানবীর মনকে এক সূত্রে বেছে দিয়েছিলেন তিনি। চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি বলে তাঁর কাব্যে শ্রীচৈতন্যের রূপ ও চরিত্রের বেশ কিছু লক্ষণ বিশেষভাবে ব্যক্ত। দেহের কাঞ্চনবর্ণ, পতিত পাবন স্বভাব,

নদীয়া নাগর মূর্তি-এসব কিছুরই বাণী রূপ দিয়েছেন তিনি তাঁর পদ গুলোর মধ্যে। কাব্যের মধ্যে ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় মধ্যযুগে একমাত্র তিনিই প্রস্ফুটিত করতে পেরেছিলেন। জয়দেবের হাত ধরে পদাবলী সাহিত্যে, যে ধারার সূচনা হয়েছিল-তার সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন গোবিন্দদাস। তাঁর মত ভক্ত ও কবির এই মিলন পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর এনেছিল। আধুনিক কালে দাঁড়িয়েও যা সমান প্রাসঙ্গিক। তবুও সবশেষে আমরা বলব-গোবিন্দদাস প্রথমে কবি, ধর্ম যতই মূল্যবান হোক না কেন-কবি প্রতিভা না থাকলে-তাঁর জীবনে চল্লিশ বছর পেরিয়ে এসে অত বড় কবি হওয়া যায় না। আর সেই জন্যই চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি হিসেবে গোবিন্দদাসের সার্থকতা সর্বজনবিদিত।

Reference :

১. গিরি, সত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃ. ১৪৫
২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং,১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃ. ১৩৩
৩. গিরি, সত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
৪. তদেব, পৃ. ২০৬
৫. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৬. গিরি, সত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
৭. তদেব, পৃ. ২৩৮
৮. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৯. গিরি, সত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
১০. তদেব, পৃ. ৩০৫
১১. তদেব, পৃ. ৩১৬
১২. তদেব, পৃ. ২৬১